ঈশ্বরের নিজের প্রকাশ

আদিপুস্তক ১১.১০-২৬পদ

১১ অধ্যায়ে আমরা আবার শেথের বংশপঞ্জিকা দেখতে পাই। আমরা যখন আমাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের ফটো অ্যালবাম দেখি, তখন তা আমাদের ভালোই লাগে। কারণ, তার দ্বারা আমাদের নিজেদের অতীতকে দেখতে পাই, আমরা কে বা আমরা কোথা থেকে এসেছি। কিন্তু আপনি যদি আপনার প্রতিবেশির বাড়ী যান, এবং তিনি আপনাকে তার পূর্বপুরুষদের ছবি দেখান বা বংশতালিকা দেখান, আপনি তার প্রতি খুব একটা আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পারেন না। একথা কেবল আপনার জন্য নয়, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সত্য। তাই, আজ যখন আবার আমরা আরও একটা বংশতালিকার সম্মুখীন হয়েছি, তখন তা আমাদের অপরিচিতদের বংশতালিকা মনে করে আমরা আমাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু বিশ্বাসী আমাদের কাছে, আজকের এই বংশতালিকা, তথা শেমের বংশতালিকা আমাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের বংশতালিকা নয়, এ হল আমাদেরই বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের বংশতালিকা। এর থেকে আমরা কে এবং আমরা কোথা থেকে এসেছি, তা উপলব্ধি করতে পারি।

কিন্তু আরও একটা বিষয় আমাদের চোখে পড়ে। ১০ অধ্যায় ২১-৩১ পদে, ইতিমধ্যে শেমের বংশাবলি একবার উল্লেখ করা হয়ে গেছে। তাহলে, ১১ অধ্যায়ে একই বিষয় কেন পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে। কারণ, বাইবেলে যখনই কোন বিষয় একাধিক বার উল্লেখ করা হয়, তখনই উপলব্ধি করতে হবে যে, তার পিছনে কোন বিশেষ কারণ লুকিয়ে আছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই কারণ হল কোন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া *(emphasis)*। কারণ, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যখন বাইবেল লিপিবদ্ধ হয়েছিল তখন কোন কম্পিউটর ছিল না যে কাট ও পেস্ট করে সম্পাদনার কাজ খুব সহজে করা যাবে। তখন কোন টাইপ-রাইটার বা জেল-পেনও ছিল না যে সহজে সুন্দর করে লেখা যাবে। তখন যা ছিল, তা হল মাটি, পাথর, কাঠকয়লা বা প্যাপিরাস (এক ধরণের জলজ উদ্ভিদ)। তাই, বাইবেলের লেখকদের কাছে ঈশ্বরের বাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হাতের লেখা অনুশীলন করার মত কোন বিলাসিতার কাজ ছিল না। পরিবর্তে, প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৫ অধ্যায়ে আমরা আদমের বংশতালিকা দেখেছিলাম, যা নোহের কথা উল্লেখ করে শেষ হয়েছিল। ১০ ও ১১ অধ্যায়ের নোহের তথা শেমের যে বংশতালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে নোহ থেকে অব্রাহাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত বংশতালিকাগুলি তুলনা করে আমরা কয়েকটি সত্য উপলব্ধি করি।

(১) মানুষের আয়ু ক্রমশ কমে গেছে। মথুশেলহ ৯৬৯ বৎসর বেঁচেছিলেন এবং ৫ অধ্যায়ে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে হনোক ছাড়া প্রায় সবাই ৯০০ বৎসর বেঁচেছিলেন (আদম-৯৩০; শেথ-৯১২; ইনোশ-৯০৫; কৈনন-৯১০; মহললেল-৮৯৫; যেরদ-৯৬২; হনোক-৩৬৫; মথূশেলহ-৯৬৯; লেমক-৭৭৭; নোহ-৯৫০)। কিন্তু ১১ অধ্যায়ে অব্রাহামের পূর্বপুরুষদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে অব্রাহামের পূর্বপুরুষদের আয়ু ক্রমশ কমে যেতে আমরা দেখেছি (শেম-৫০০;অর্ফকষদ-৪০৩;শেলহ-৪০৩;এবর-৪৩০;পেলগ-২০৩;রিয়ূ-২০৭;সরূগ-২০০;নাহোর-১১৯; তেরহ-২০৫ এবং অব্রাহাম-১৭৫)। অর্থাৎ মানুষের পাপকার্যের ফলস্বরূপ পৃথিবীর পরিবেশ এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে, সেই পরিবেশে বেশি বৎসর বেঁচে থাকা আর সম্ভ ব নয়। এ ছাড়াও ৬.৩ পদে আমরা উল্লেখ পেয়েছি যে, ঈশ্বর বন্যার পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে মানুষের আয়ু গড়ে ১২০ বৎসর স্থির করে দিয়েছিলেন।

(২) ক্রমশ কম বয়সে প্রথম সন্তানকে জন্ম দান। ৫ এবং ১১ অধ্যায়ের বংশপঞ্জিকা দুটি তুলনার দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, ক্রমশ কম বয়সে প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে। শেথ ১০৫ বৎসর বয়সে ইনোশকে জন্ম

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

দিয়েছিলেন;মথুশেলহ ১৮৭ বৎসর বয়সে লেমককে জন্ম দিয়েছিলেন; নোহ ৫০০ বৎসর বয়সে শেমকে জন্ম দিয়েছিলেন;কিন্তু অর্ফকষদ ৩৫ বৎসর বয়সে;শেলহ ৩০ বৎসর বয়সে;এবর ৩৪ বৎসরে;পেলগ ৩০ বৎসরে;রিয়ূ ৩২ বৎসরে;সরূগ ৩২ বৎসরে;এবং নাহোর ২৯ বৎসরে প্রথম সন্তানকে জন্ম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, বর্তমান যুগে মানুষ যে বয়সে সন্তানদের জন্ম দেয়, তার সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অব্রাহামের যখন ১০০ বৎসর বয়স এবং তাঁর স্ত্রীর ৯০ বৎসর বয়স (১৭.১৭;১৮.১২), তখন ঈশ্বর অব্রাহামের স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের জন্মের কথা বললে, তা তাদের কাছে হাসির কথা মনে হয়েছিল। এর কারণ অব্রাহামের বেশি বয়স হওয়া নয়, কারণ তেরহের বয়স যখন ১৩০ বৎসর (২০৫-৭৫) (১১.৩২ এবং ১২.৪) তখন অব্রাহামের জন্ম হয়েছিল। তাহলে, ১০০ বৎসর বয়সে অব্রাহাম কেন সন্তানকে জন্ম দিতে পারবে না? কেবল তাই নয়, সারার মৃত্যুর পর অব্রাহাম আবার বিবাহ করেছিল ও অন্যান্য সন্তানদের জন্ম দিয়েছিল (২৫.১-৪)। আসলে যে কারণে তারা হেসেছিল (১৮.১১), তা হল, সারার পক্ষে যদি সন্তান জন্মদান সম্ভব হত, তাহলে অনেক আগেই তা সধিত হওয়া উচিৎ ছিল; অর্থাৎ অব্রাহামের উচিৎ ছিল আরও কম বয়সে প্রথম সন্তানের পিতা হওয়া।

এই সমস্ত সত্য উপলব্ধির দ্বারা বাইবেলের সত্যতা তথা বিশ্বস্ততার প্রতি আমাদের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। বাইবেল পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের লেখা কাব্যগ্রন্থদের মধ্যে একটি নয়। স্বয়ং ঈশ্বর এর লেখক এবং এর প্রতিটি কথা সত্য। মানুষ আমাদের প্রয়োজনে ঈশ্বর নিজেকে নিজে আমাদের কাছে বাইবেলে প্রকাশ করেছেন *(Self-revelation)*। কারণ, প্রকৃত ঈশ্বরকে যদি আমরা না জানি, আমরা কখনও তাঁর সেবা, আরাধনা বা গৌরব করতে পারি না। কিন্তু বাইবেল এবং ইতিহাস আমাদের কাছে সাক্ষ্য দেয় যে, এই কাজে মানুষ আমরা বারংবার ব্যর্থ হয়েছি। এরই ফলস্বরূপ, আমরা প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা করার পরিবর্তে, অবিশ্বাসীদের ন্যায় মিথ্যা ধর্মাচরণ করে চলেছি। আমরা ধর্ম পালনের দ্বারা নিজেদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাই, ঈশ্বরের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাতে চাই।

ঈশ্বরকে আমরা আলাদিনের প্রদীপের দৈত্য হিসাবে চিন্তা করেছি -- আমাদের প্রার্থনা নামক আধ্যাত্মিক আচরণের দ্বারা তাঁকে আমাদের ইচ্ছা পালন করতে বাধ্য করতে চাই। আমরা বিভিন্ন ভাবে বাইবেলের ঈশ্বরকে প্রকৃত ঈশ্বর হওয়া থেকে নিচে নামিয়ে আনি।

১) তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে ভাগ করে, আমরা তাঁকে ছোট করি। অবিশ্বাসীরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে মানসিক শান্তি পায় না; তারা তাই তাঁর ক্ষমতাকে ৩৩ কোটি দেবতাদের মধ্যে বিভক্ত করেছে। মণ্ডলীর ইতিহাসেও আমরা একই ঘটনা দেখতে পেয়েছি, যখন তাঁর ক্ষমতাকে বিভিন্ন সন্তদের মধ্যে ও মরিয়মের মধ্যে বিভক্ত করা হযেছে। বর্তমান যুগেও, 'যত মত তত পথ' নামক চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় দানের মধ্যেও তা প্রকাশ পেয়েছে। আবার বিজ্ঞান, রাজনৈতিক দল বা তথ্য-প্রযুক্তির উপর বিশ্বাসের দ্বারাও আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিভক্ত করে চলেছি।

২) তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে, আমরা তাঁকে ছোট করি। অবিশ্বাসীরা প্রতিমা নির্মাণের দ্বারা যে সত্যকে খাড়া করতে চায়, তা হল -- ঈশ্বর মানুষের জন্য কী করেছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়;কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের জন্য কী কী করেছে। প্রতিমা নির্মাণের মাধ্যমে মানুষ ভাবে সে তো ঈশ্বরের প্রয়োজন মিটিয়েছে -- তাঁকে আকার দিয়েছে, তাঁকে ঘরে রেখেছে, তাঁকে কাপড় পড়িয়েছে, তাঁকে খেতে দিয়েছে। এর পিছনে মানুষের নিজের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার -- ঈশ্বরের সমস্ত প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে মানুষের প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট, তাই তিনি মানুষদের আশীর্বাদ করতে, রক্ষা করতে ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাধ্য। এইভাবে ঈশ্বরকে কাজ করতে বাধ্য করার দ্বারা আমরা তাঁর স্বায়ত্বশাসনকে *(autonomy)* সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছি। আমরা কী বোকা! কারণ, আমাদের জীবন ও সমস্ত বিষয়ের জন্য আমরা তাঁর কাছে যে কতখানি ঋণী, তা স্মরণ করি না। আমরা যেন সর্বদা একথা স্মরণে রাখি যে, আমরা ঈশ্বরকে ভালাবাসি কারণ তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু 'ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন, কারণ তাঁর আমাদের প্রয়োজন' -- একথা কখনও সত্য নয়। ঈশ্বর স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ায়,

যদিও আমাকে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, তথাপি তিনি আমাকে ভালোবাসেন। কারণ এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

৩) তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে পরিবর্তিত করে, আমরা তাঁকে ছোট করি। আমাদের নিজেদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য, আমরা অনেক সময় ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতাকে পরিবর্তিত করে থাকি। শিমোন যাদুকর এমন কাজই করতে চেয়েছিল (প্রেরিত ৮.৯-২৩)। আমরাও আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ক্ষমতার দ্বারা অলৌকিক কাজ সাধিত হবার আকাঙ্খা করি, কিন্তু তাঁর ক্ষমতার দ্বারা আমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। আমরা এমন প্রার্থনা করি, "আমার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন কর, কিন্তু আমাকে পরিবর্তিত কোরো না" (মথি ৭.২২-২৩)।

কিন্তু ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমাদের বলেন, ১) আমি ছাড়া তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক, ২) প্রতিমা পূজা কোরো না এবং, ৩) ঈশ্বরের নাম অনর্থক ব্যবহার কোরো না। তাই প্রকৃত ঈশ্বরকে জানতে আমাদের তাঁর বাক্য পড়তে হবে। বাইবেল কোন দৈনিক পঞ্জিকা বা রাশিফল (কোষ্ঠী) নয়, যা পাঠ ও পালনের দ্বারা দিন ভালো যেতে পারে। বাইবেল ঈশ্বরের নিজের প্রকাশ। তাই, বাইবেল পাঠের দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি। আসুন, তাঁকে জানি ও তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবন যাপন করি।